জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

মুহিউদ্দীন খান

রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ কর্তৃক পরিচালিত □জিহাদ আন্দোলন□ উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক-ভিত্তিক এক গণ-অভ্যুত্থানরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এ আন্দোলন ছিল প্রধানত পারিপার্শ্বিক নানা অপ-প্রভাবে কলুষিত মুসলিম জনগণের ঈমান-আকীদাকে শির্ক, বিদ□আত, বিজাতীয় অনুকরণ প্রভৃতি নানা জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে পূর্ণ ঈমানী জৌলুস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিচালিত।

মোগল সালতানাতের পতন যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে জাঠ, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি মুসলিমবিদ্বেষী শক্তিগুলোর ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয়। পূর্বদিকে বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজ বণিকেরা দখল করে নেয়। শিখ সামন্তরাজা রঞ্জিত সিং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দখল করে লাহোরকেন্দ্রিক একটা শক্তিশালী শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসে। নবোত্থিত এই শিখ শক্তির আগ্রাসী থাবায় পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম জনগণ পর্যায়ক্রমে পর্যুদস্ত হতে থাকে।

অপরদিকে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে নেমে আসে মারাত্মক অধঃপতন। ঈমান-আকীদার স্থান দখল করে বসে নানা কুসংস্কার ও বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা। মুসলিম জনগণ পরিণত হয় নামসর্বস্ব মুসলমানে। সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যে শিয়া ধ্যান-ধারণা, পীর পূজা, গোর-পূজাসহ অগণিত শির্ক-বিদ□আত স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নেমে আসা ক্রমবর্ধমান অধোগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে এ স্তরের লোকেরা ভোগ-বিলাসের আত্মঘাতী পথে গা ভাসিয়ে দেয়।
অপরদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম জনগণ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের নানা আচার-আচরণে ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক এলাকার মুসলিম জনগণ নামের সংগে হিন্দু পদবী গ্রহণ করাকে গৌরবজনক কৌলিন্যের লক্ষণ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে।

পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের বহু লুণ্ঠিত জনজপদের মুসলিম নারীদেরকে শিখেরা বাঁদীরূপে ব্যবহার এবং প্রকাশ্য হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে থাকে। মসজিদে আযান এবং জুমা-জামাত বন্ধ হয়ে যায়।

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য সন্তান এবং সার্থক উত্তরাধিকারী শাহ আবদুল আজীজ তখন জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রঃ)-এর যে সংগ্রামী উত্তরাধিকার তাঁর ধমনীতে প্রবহমান ছিল, সে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তিনি একটা ব্যাপক সংস্কার আন্দোলন শুরু করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি আগ্রাসী শিখ ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তাঁর প্রিয় শাগরেদ মাওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঐতিহ্যবাহী এক বুযুর্গ পরিবারের সন্তান সুঠামদেহী যুবক সৈয়দ আহমদের অসীম মনোবল এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লক্ষ্য করে এ গুরুদায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাঈল, জামাতা মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী এবং অন্য এক প্রিয় শাগরেদ মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালীকে যুক্ত করে দেন।

বলাবাহুল্য, সৈয়দ আহমদ শহীদের এ মহৎ আন্দোলন সংগঠন, পরিচালনা এবং প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বাংলার বীর সন্তান মাওলানা ইমামুদ্দীনের দুঃসাহসী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সৈয়দ সাহেব প্রথমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক তাবলিগী সফর শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি অনুধাবন করেন যে, বৈরী শক্তির মুকাবিলা করার মতো বাস্তব পদক্ষেপ ব্যতীত শুধু ওয়াজ-নসিহতের দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না, তখন তিনি শিখদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। জিহাদ শুরু করার আগে নিবেদিতপ্রাণ একদল মুজাহিদ তৈরী করা এবং জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া জাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মুজাহিদ তৈরী করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটা অংশ হিসেবেই সদলবলে তিনি হজ্জের সফরে রওনা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তখনকার দিনে এ সফর ছিল যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি সময়সাপেক্ষ। সৈয়দ সাহেব অন্তত তিন বছরে এই সফর সমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর আন্দোলন শুরু করার সূচনাতে স্বীয় উস্তাদ শাহ আবদুল আজীজের যে কয়জন শাগরেদকে তাঁর উপদেষ্টা এবং সার্বক্ষণিক সংগীরূপে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালী। এছাড়া জিহাদ আন্দোলনের আর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ও সংগঠক ছিলেন সূফী নূর মুহাম্মদ নামক বিশিষ্ট সাধক আলেম। এঁরা উভয়ই ছিলেন সৈয়দ সাহেবের বিশিষ্ট খলীফা এবং জিহাদ আন্দোলনের প্রথম কাতারের নেতা ও সংগঠক। এ দুই মহান সাধক বীর পুরুষের মাধ্যমেই জিহাদ আন্দোলনের সাথে বাংলার জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে মাওলানা ইমামুদ্দিন ছিলেন নোয়াখালী জেলার হাজীপুরের অধিবাসী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। এছাড়া হজ্জের সফরে রওনা হয়ে কলিকাতায় দীর্ঘ তিনমাস অবস্থান করেও সৈয়দ সাহেব বহুলোককে প্রত্যক্ষভাবে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সৈয়দ সাহেব হিজরী ১২৩৬ সনের ১লা শওয়াল (১৮২০খৃ.) ঈদের নামায বাদ রায়বেরেলী থেকে চারশ� সংগীসহ নৌকাযোগে কলকাতার পথে রওনা হন। উদ্দেশ্য, কলকাতা থেকে জাহাজ ভাড়া করে জেদ্দায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

পথে পথে বিভিন্ন স্থানে মনযিল এবং তাবলীগী সমাবেশ করার পর দীর্ঘ চারমাস পর রাজমহলের পথে এই কাফেলা বাংলার জমীনে এসে প্রবেশ করে। বাংলার সীমান্তে কাফেলার অভ্যর্থনার বর্ণনা দিতে গিয়ে �ওয়াকায়ে-এ আহ্মদী�র লেখক বলেনঃ রাজমহল থেকে মুন্সী মুহাম্মদী আনসারী নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবকে দশ-বারো ক্রোশ দূরবর্তী তাঁর গ্রামে নিয়ে যান। সেখানে মুন্সী মুন্সী মুহাম্মদী আন্সারীর পিতা মুন্সী রউফউদ্দীন, মুন্সী মখদুম বখশ, হাসান আলী, ফজলুর রহমান এবং মুন্সী আযীযুর রহমান সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হন। এঁদের মধ্য থেকে মুন্সী রউফউদ্দীন ও মুন্সী ফজলুর রহমান কাফেলার সংগে শরীক হন।

রাজমহল থেকে রওনা হয়ে ৫ই সফর কাফেলা মুর্শিদাবাদ পৌঁছে। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট লোকদের অধিকাংশই ছিল তখন শিয়া মতের অনুসারী। তাযিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল তাদের প্রধান উপজীব্য। সৈয়দ সাহেব মাওলানা আবদুল হাইকে ওয়ায করার নির্দেশ দিলেন। ওয়াযের প্রভাবে শত শত লোক সৈয়দ সাহেবের হাতে বায়আত হয়ে সকল কুসংস্কার মুক্ত হন। মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা হয়ে কাফেলা একরাত কাটোয়ায় অবস্থান করে। সেখান থেকে কাফেলা হুগলী বন্দরে উপনীত হয়। হুগলীতে সাতদিন অবস্থান করে কয়েক হাজার লোককে মুরীদ করা হয়।

কাফেলা হুগলী বন্দরে থাকতেই কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী মুন্সী আমিনউদ্দীন নৌকাযোগে এসে হযরত সৈয়দ সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং কাফেলার সব লোককে তাঁর মেহমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মুন্সী আমিনউদ্দীন ছিলেন কলকাতার একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। মুন্সী সাহেবের আন্তরিক ভক্তি এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে সৈয়দ সাহেব তার মেহমানদারী কবুল করতে সম্মত হন। মুন্সী আমিনউদ্দীন হযরত সৈয়দ সাহেবের কাফেলার মেহমানদারীর জন্যে শহরের উপকণ্ঠে একটা সুপ্রশস্ত বাগানবাড়ী ক্রয় করে রেখেছিলেন। কাফেলার নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই এই বাড়ীতে ভালভাবে সংকুলান হয়ে গেল। পথে পথে যারা কাফেলায় এসে শরীক হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে তখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচশতের মতো।

সৈয়দ সাহেবের কাফেলা দীর্ঘ তিনমাস কলকাতায় অবস্থান করেছিল। এ সময়কালের মধ্যে প্রতিদিন বাদ ফযর কাফেলার অবস্থান স্থলে ওয়ায-মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। ভক্তদের অনুরোধে সৈয়দ সাহেব বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে আয়োজিত মজলিসে গিয়েও শরীক হতেন। বাংলার মুজাহিদীনের জামাত এখান থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করে।

ওয়াকায়ে-এ আহমদীর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিদিন শত শত লোক এসে মুন্সী আমিনউদ্দীনের বাগান বাড়ীতে সমবেত হতো। সৈয়দ সাহেবের ওয়ায-নসীহত শুনত এবং বায়আত গ্রহণ করে শির্ক-বিদআদ থেকে তওবা করতো।

বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় সৈয়দ সাহেবের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মওলানা ইমামুদ্দীন তাঁর জন্মভূমি নোয়াখালী এবং সূফী নূর মুহাম্মদ চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকায় রওনা হয়ে যান। মাওলানা ইমামুদ্দীনের সংগে নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং মোমেনশাহী এলাকায় অর্ধশত বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে উপনীত হন। সূফী নূর মুহম্মদ নিয়ে আসেন সিলেট ও চট্টগ্রামের কিছু বিশিষ্ট লোক। সূফী সাহেবের এই কাফেলার সংগেই এসেছলেন বাংলার অন্যতম মুজাহিদ সংগঠক মাওলানা আবদুল হাকীম চাটগামী, ময়মনসিংহের মুন্সী ইবরাহীম ও সৈয়দ হামযা আরাকানী প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

কলকাতার সফরেই মৌলভী বরকতুল্লাহ্‌ এবং মৌলভী এনায়েতুল্লাহ্‌ ওরফে কাযী মিয়াজান নামক আরও দু ব্যক্তি হযরত সৈয়দ সাহেবের খিলাফত লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

দীর্ঘ দু বছর হজ্জের সফরে কাটানোর পর সৈয়দ সাহেব বোম্বে হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ফেরার পথেও সৈয়দ সাহেব কলকাতায় কিছুকাল অবস্থান করে বাংলার জামাতকে সুসংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন পূর্ব বাংলার নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা ও মোমেনশাহী এলাকায় প্রেরিত হন। মৌলভী বরকতুল্লাহ্‌ উত্তর বঙ্গ এবং সূফী নূর মুহাম্মদ কলকাতার আশেপাশে প্রচার ও সংগঠনের কাজ শুরু করেন।

> আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের আকীদা ও আমলের সংস্কার। দ্বিতীয় জনসাধারণের মধ্যে ইস্‌লামী জীবনধারা সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করা। তৃতীয় পর্যায়ে সর্বপ্রকার বৈরী শক্তির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। চতুর্থ পর্যায়ে জান-মাল দিয়ে কেন্দ্রীয় মুজাহিদ আন্দোলনকে সহযোগিতা দান করার অংগীকার গ্রহণ করা।

মাওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ, মৌলভী বরকতুল্লাহ্‌ এবং মাওলানা আবদুল হাকীমের নেতৃত্বে বাংলার মাটিতে আন্দোলনের চারটি পর্যায়েই ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলা হান্টারের ভাষায়- বাংলায় এমন কোন জনপদ ছিল না, যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো, বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে একদিন তারা সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।

দু বছর এগারো মাস হজ্জের সফর সমাপ্ত করে সৈয়দ সাহেব রায়বেরেলী পৌঁছেন। ততদিনে বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার ফলে শির্ক ও বিদআতের সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে খালেস তওহীদের বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল।
সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশের প্রতিটি জনপদের মুসলিম জনগণের জন্য মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। হজ্জ থেকে ফিরে যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, আগ্রাসী শিখ সামন্ত শাসকেরা পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সর্বত্র মসজিদে আযান এবং জামাত বন্ধ করে দিয়েছে, স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করার সকল সুযোগ রুদ্ধ করা হয়েছে, অনেক এলাকার মুসলিম নারী-শিশুদের জবরদস্তি করে ধরে এনে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করা হচ্ছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে তিনি শিখ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার দৃঢ সংকল্প ঘোষণা করলেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী ও সূফী নূর মুহাম্মদ প্রমুখ প্রথম সারির খলীফাগণকে জিহাদের কাফেলায় লোকজন সমবেত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো। উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি মোমেন দেহলভী ছিলেন সৈয়দ সাহেবের একজন বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা। তিনি জিহাদের গীত রচনা করলেন। মুরীদগণের মুখে মুখে তা সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো।
সৈয়দ সাহেবের হজ্জ থেকে ফেরার পথে এনায়েতুল্লাহ্‌ নামক ভাগীরথী তীরের এক নওজোয়ান তাঁর কাফেলায় শরীক হয়ে খিলাফত লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মোমেন দেহলভীর জিহাদী কাসীদা পাঠ করে লোকজনকে উদ্দীপিত করার দায়িত্ব নিলেন।

সৈয়দ সাহেব তাঁর আসন্ন জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে একটা ইশতেহার রচনা করলেন। ইশতেহারের বক্তব্য ছিল

নিম্নরূপঃ

শিখ জাতি বেশ কিছুকাল যাবত লাহোর এবং আশপাশের এক বিস্তীর্ণ এলাকার উপর জবর দখল কায়েম করে বসে আছে। এদের অত্যাচার নির্যাতন সভ্যতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে। এরা হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে। অগণিত মুসলমানকে লাঞ্চিত করেছে। মসজিদে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গরু জবেহ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। অত্যাচার নির্যাতন সীমাতিক্রম করার পর সংশ্লিষ্ট মুসলিম জনগণকে জাগ্রত ও সুসংগঠিত করে আগ্রাসী শিখ শক্তির মুকাবেলায় দাঁড়ানোর জন্য জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মুজাহিদ জিহাদে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। ইন্শা-আল্লাহ্ খুব শীঘ্রই সশস্ত্র জিহাদ শুরু হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানকে স্ব স্ব সাধ্য অনুযায়ী এই মহত্তম কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে।

মুজাহেদীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাজানো মোকদ্দমার নথিপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করার সেদিনটি ছিল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর। সেদিন থেকেই সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র মুজাহিদগণ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মাওলানা জাফর থানেশ্বরি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ মাওলানা সৈয়দ আহমদ যখন শত শত মাইল দূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সংকল্প ঘোষণা করেন তখন অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে, দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সুদূর সীমান্ত এলাকায় গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ কি?

সৈয়দ সাহেব জবাবে বলেছিলেন, প্রথমত ইংরেজরা এখনো মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। শিখেরা ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করছে। দ্বিতীয়ত এদেশে ইংরেজ আধিপত্য মজবুত করার পিছনে শিখদের সক্রিয় সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তৃতীয়ত সীমান্ত মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র উপমহাদেশকে সর্বপ্রকার শত্রুর কবলমুক্ত করা সহজ হবে।

উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য সামনে নিয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ হিজরী ১২৪১ (১৮২৫খৃঃ) সনের প্রথমদিকে জন্মস্থল রায়বেরেলী থেকে যাত্রা শুরু করলেন, তাঁর সংগী-সাথীর সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার। এর মধ্যে কাফেলার রোজ-নামচা লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মুজাহিদ সংখ্যা ছিল এক হাজারের কাছাকাছি। তন্মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন চল্লিশ জনের মতো। পাঞ্জাব ও সীমান্ত এলাকার মুসলমানদের হৃত ধর্মীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অগ্রসরমান এই দীনি কাফেলা যাতে যাত্রা পথেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্যে পাঞ্জাবের পথ পরিহার করে তাঁরা সিন্ধুর পথে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে পথে হায়দারাবাদ, সিন্ধু, বাহওয়ালপুর হয়ে বোলান উপত্যকা অতিক্রম করে প্রথমে কান্দাহার ও পরে কাবুল গিয়ে উপনীত হন। পথিমধ্যে সিন্ধুর হায়দারাবাদ ও বাহওয়ালপুর এলাকার মুসলমানদের মধ্যেও জিহাদের দাওয়াত চলতে থাকে। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালী, সূফী নূর মুহাম্মদ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেম ও বুযুর্গগণ স্থানে স্থানে ওয়ায-নসিহত করে জনগণকে জিহাদের মন্ত্রে উদ্দীপিত করতে থাকেন।

হিন্দুস্তান থেকে কাবুল পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং নতুন লোক ও অর্থ পৌঁছানোর সুব্যবস্থাও সম্পন্ন করা হয়।

কাবুলে কিছুকাল অবস্থান করে খায়বার গিরি পথ হয়ে কাফেলা এসে পেশোয়ার পৌঁছে। পেশোয়ারে তখন রঞ্জিত সিএর তরফ থেকে একজন সুবেদার নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করে লাহোরে প্রেরণ করতেন। শিখ সেনাদের ছাউনী ছিল আটক দরিয়ার পূর্বপারে পাঞ্জাব সীমান্তে অবস্থিত একটি দুর্গে। দুর্গ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত নিয়মিত সশস্ত্র প্রহরায় ডাক চলাচল করতো।

কোন কসবা বা শহরের লোকেরা অবাধ্যতা শুরু করলেই দুর্গ থেকে সৈন্য প্রেরণ করা হতো। চালানো হতো অবাধ লুণ্ঠন এবং অগ্নি সংযোগ। নির্বিচারে হত্যা করা হতো সে এলাকার লোকজনকে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে কাফেলাসহ পেশোয়ার উপত্যকা পিছনে রেখে নওশেরায় গিয়ে উপনীত হলেন। এখানে দরিয়া আবাসীনের তীরে অবস্থান গ্রহণ করে নিজস্ব একজন দূতের মারফত রঞ্জিত সিং-এর লাহোর দরবারে একটা বিস্তারিত পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তাঁর এই অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে মুসলিম জনগণের সংগে এ পর্যন্ত যে সব জুলুম করা হয়েছে তা বন্ধ করার

নিশ্চয়তা বিধান এবং জবর দখলকৃত মুসলিম এলাকাগুলো মুক্ত করে দেওয়ার দাবী জানানো হলো।

উদ্ধত লাহোর দরবার একজন সংসারত্যাগী ফকীরের এ পত্রের কোন জবাব না দিয়ে মুজাহিদীণের এ কাফেলাকে শায়েস্তা করার হুকুম দিয়ে সরদার বুধসিং-এর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। মুজাহিদগণের সংগে বুধসিং-এর মুকাবেলা হয় নওশেরা থেকে সাত-আট মাইল দূরবর্তী আকোড়াখটক নামক স্থানে। প্রথম এই মুকাবেলায় সরদার বুধসিং-এর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

আকোড়াখটকের যুদ্ধে বুধসিং-এর পরাজয়ের ফলে পেশোয়ারের সাথে শিখদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পেশোয়ারের সুবেদার ইয়ার মুহাম্মদ খান এবং তার ভাই পীর মুহাম্মদ খান এ খবর শোনার পর পত্র মারফত মুজাহিদগণের সংগে যোগাযোগ করতে শুরু করেন।

সরদার বুধসিংকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই মুজাহিদগণ শিখদের তরফ থেকে একটা বড় ধরনের আক্রমণের আশংকা পোষণ করে আসছিলেন। নওশেরার পূর্বদিকে সিদোতে সম্ভাব্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করলেন। ইতিমধ্যে হাযরো নামক স্থানে শিখদের একটা সমাবেশের খবর আসলো। মনযুরা নামক রোজনামচার বর্ণনা অনুযায়ী বাংলার মুজাহিদগণ দ্বারা গঠিত একটা নৈশ অভিযানকারী দল অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সে সমাবেশটা সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেয়। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং রসদপত্র মুজাহিদগণের হস্তগত হয়।

পরপর দুটি সংঘর্ষে জয়লাভ করার পর মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এলাকার জনগণের আস্থাও অনেকটা বর্ধিত হলো। এলাকার বিশিষ্ট আলেম এবং গোত্র সরদারগণের এক সমাবেশে ১৮২৭ সনেও ১১ই জানুয়ারী হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদকে আমিরুল মুমেনীন রূপে ঘোষণা করে তাঁর হাতে জিহাদ এবং ইমামতের বায়আত গ্রহণ করা হলো। পেশোয়ারের আমীর সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান দূত মারফত পত্র প্রেরণ করে আমীরুল মুমেনীন-এর প্রতি আনুগত্য বহাল রেখে বিশিষ্ট আলেমগণের একটি পরামর্শ মজলিশ কায়েম করে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী আইন কানুন জারী করার সুব্যবস্থা করেন। মনযুরার লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী পেশোয়ারকেন্দ্রিক ইসলামী হুকুমতের পরামর্শ সভায় যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালী।

পাঠান গোত্রপতিদের একটা অংশ প্রথম থেকেই হযরত সৈয়দ আহমদের কর্মতৎপরতার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারছিল না। শিখদের সাথে এদের নানা ধরণের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। তাছাড়া দীর্ঘকালের নানা কুসংস্কারের ভাগাড়ে নিমজ্জিত মন-মানসিকতায় সৈয়দ সাহেবের কঠোর সংস্কার আন্দোলন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল। পাঠানরা সাধারণতঃ পীরভক্ত জাতি। এদের এই স্বাভাবিক প্রবণতার সুযোগ নিয়ে প্রতি এলাকায় গড়ে উঠেছিল অসংখ পীরের গদী। এসব পীরের অধিকাংশ ছিল শরীয়তের অনুশাসনের সাথে সম্পর্কহীন এবং আকণ্ঠ নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত। সৈয়দ সাহেবেরর সংস্কার আন্দোলন তাদের গদিভিত্তিক স্বার্থ বিপন্ন করার উপক্রম করেছিল। তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার শুরু করলো। লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টারা এ বিরোধিতার আগুনে নানাভাবে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলো না। পাঞ্জাব এবং সীমান্তের এক শ্রেণীর পেশাদার আলেমকে দিয়ে মুজাহিদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ফতওয়াবাজী শুরু করানো হলো। শিখদের কিছু অনুচরকে কৌশলে মুজাহিদগণের কাফেলার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানো হলো। সিন্দুর যুদ্ধ যেদিন শুরু হয়, তার আগের রাত্রে হযরত সৈয়দ সাহেবের খাদ্য বিষ মিশিয়ে দেওয়া হলো। সকাল বেলায় মাওলানা মুহম্মাদ ইসমাঈল সৈয়দ সাহেবের শয়ন কক্ষে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। তড়িৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে কিছুটা উপশম দেখা দিল। ইতিমধ্যে সিন্দুর ময়দানে বিরাট শিখ বাহিনীর হামলা শুরু হয়ে গিয়েছেল। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত এ বাহিনীর মুকাবেলা করার মত অস্ত্র বা লোকবল মুজাহিদগণের ছিল না। স্বয়ং সৈয়দ সাহেব ছিলেন বিষক্রিয়ায় মৃতপ্রায়। এ অবস্থার মধ্যেই মুজাহিদগণ যুদ্ধ শুরু করলেন। সৈয়দ সাহেব একটু সুস্থ বোধ করলে কয়েকজন লোকের কাঁধে ভর করে তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার হলেন এবং ময়দানে চলে গেলেন। তুমুল যুদ্ধের পর মুজাহিদগণের আংশিক পরাজয় হলো এবং ময়দান ছেড়ে তাঁরা কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শিখ সৈন্যও অগ্রসর হতে পারলো না।

সিন্দুর যুদ্ধের ফলাফল প্রতিকুলে যাওয়ার পর থেকে মুজাহিদগণের সামনে একের পর এক নানা সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসলো। শিখ এবং ইংরেজদের নিয়োজিত অনুচরবৃন্দের নানা অপপ্রচারের তাণ্ডবের মুখে আন্দোলনের গতি মূল হিন্দুস্তানের অনেকটা শ্লথ হয়ে পড়লো। কাফেলার খাদ্য এবং অন্যান্য রসদ মূলত হিন্দুস্তানীর সরবরাহ থেকেই আসতো। শিখেরা এ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে এমন কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল যার ফলশ্রুতিতে মূল আন্দোলন মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হলো। মৌলবী মাহবুব আলী নামক একজন মুজাহিদ নেতার নেতৃত্বে বিহারের এবং বাংলার একদল মুজাহিদ

পেশওয়ারের পথে রওনা হয়ে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার পর দুররানী পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং লুণ্ঠিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে মূল কাফেলা পর্যন্ত এসে উপনীত হন। পাঠানদের দুর্ব্যবহারে মৌলভী সাহেব এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, কাফেলার লোকজনকে তিনি দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তুমুল প্রচারণা শুরু করেন। ফলে কিছুলোক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তাঁর সাথে দেশে ফিরে আসে। এতে মুজাহিদ বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড শীতে ও খাদ্যাভাবে মুজাহিদগণ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হন। অনেক সময় দিনের পর দিন তাঁরা গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতেন। এ সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যেই হযরত সৈয়দ সাহেবের অন্যতম প্রিয় সাথী এবং সর্বাপ্রেক্ষা প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা বলে পরিচিত মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী ইন্তেকাল করেন (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮খৃঃ)।

"ওয়াকায়ে-এ আহমদী"র লেখকের মতে মুজাহিদ আন্দোলনের এই চরম দুর্দিনে সর্বপ্রথম নতুন লস্কর এবং অর্থ-সাহায্য এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। ঢাকার মুজাহিদগণের দ্বারা প্রেরিত এই সাহায্য পৌঁছার পর থেকে একটানা উপবাসের অবসান হয়। মুজাহিদগণ নতুন করে উদ্দীপনা লাভ করেন।

> "জন্মভূমি এবং পরিবার-পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অপরিচিত অনভ্যস্ত দুর্গম পার্বত্য এলাকার প্রতিকূল পরিবেশে সীমাহীন আপদ-বিপদের মধ্যেও মুজাহিদগণ শিখদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে যেতে লাগলো। মাওলানা ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এসব অভিযানের প্রতিটিতেই বিপুল সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজা রঞ্জিত সিং সৈয়দ সাহেবের আবাসীন দরিয়ার বাম দিককার সমগ্র এলাকা ছেড়ে দিয়ে তাঁর সংগে আপোষ-মীমাংসা করার প্রস্তাবসহ হাকীম আজীজুদ্দিন ও সরদার ওজীর সিংকে দূতরূপে প্রেরণ করে। সৈয়দ সাহেব মৌলবী খায়রুদ্দীন শিরকুটী ও হাজী বাহাদুর খানের মাধ্যমে সন্ধির শর্তাদি লিখে পাঠান। তাঁর দাবী ছিল, সীমান্তের যেসব এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেছে, সেসব এলাকায় শিখেরা আর আক্রমণ করবে না। শিখ শাসিত অবশিষ্ট এলাকায় মুসলমানদিগকে পূর্ণ ধর্মীয় আজাদী দিতে হবে। দখলীকৃত মসজিদগুলো ছেড়ে দিতে হবে"।

রঞ্জিত সিং এসব শর্ত মেনে নিয়েই মুজাহিদগণের সংগে একটা সম্মানজনক সন্ধি করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লাহোর দরবারের ইংরেজ উপদেষ্টা জেনারেল ভিন্টোরা সন্ধির প্রস্তাবে একমত না হয়ে নানা কূটকৌশলের পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিল। এরা এমন একটা ষড়যন্ত্রের নীলনক্শা তৈরী করলো, যদ্দ্বারা পাঠান সর্দার এবং মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করে দেওয়া যায়। ফলে দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই শিখদের পরিবর্তে মুজাহিদগণ পাঠান সর্দারদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। পেশওয়ারের আমীর সরদার বাহাদুর খান জেনারেল ভিন্টোয়ার উস্কানীতে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো। কিন্তু প্রথম হামলাতেই বাহাদুর খান নিহত এবং সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে গেল। তার কনিষ্ঠ সহোদর সর্দার সুলতান মুহাম্মদ খান আরবাব ফয়জুল্লাহর মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং পেশওয়ারের আমীর পদে তাকে বহাল করা হয়। মাওলানা সৈয়দ মাজহার আলী আজিমাবাদীকে প্রধান কাজী নিযুক্ত করে শাসন ও বিচার বিভাগের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত জারী করা হয়। কিন্তু ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মুখে এ ব্যবস্থা বেশী দিন টিকে থাকতে পারলো না। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পাঠান সর্দারদের মধ্যে শরীয়তের স্বচ্ছ জীবন-ব্যবস্থা নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। এ সুযোগে লাহোর দরবারের উপদেষ্টা জেনারেল ভিন্টোরা পাঠান সর্দারদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বণ্টন করে সৈয়দ সাহেবের তরফ থেকে নিয়োজিত ওশর আদায়কারী মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে একই রাতে হত্যা করার ব্যবস্থা করে। বার্মা সীমান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে আগত আল্লাহর পথে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ, যাঁরা বাড়ীঘর পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে সীমান্তের জনগণকে শিখ নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে এসেছিলেন, তাদের সবাইকে একই রাতে এশার নামাযে রত অবস্থায় অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হলো।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবর সৈয়দ সাহেব এমন মর্মাহত হয়েছিলেন যে, পাঠানদের মধ্যে কাজ করার সকল উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেললেন। মুজাহিদগণকে ডেকে স্ব স্ব জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। কিছুলোক তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এলো। কিন্তু অন্যান্য অনেকের সংগেই বাংলার মুজাহিদগণ সৈয়দ সাহেবের সংগত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন না। "ওয়াকায়ে-এ আহমদী"র লেখকের মতে এই সঙ্কটজনক অবস্থায় মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং মৌলবী এনায়েতুল্লাহ উরফে মিয়াজান কাজীর উদ্দীপনা মুজাহিদগণের মধ্যে নতুন মনোবলের সৃষ্টি করেছিল।

পেশোয়ার উপত্যকায় অবস্থান অর্থহীন বিবেচনা করে সৈয়দ সাহেব কাগানের পার্বত্য এলাকার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

সেদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু পথিমধ্যে বালাকোটের সন্নিকটে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে সর্দার শেরসিং-এর নেতৃত্বে একটি বিরাট শিখ সৈন্যবাহিনী এসে সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেললো। বালাকোটের ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো শেষযুদ্ধ। এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জয়ী হয়েও সংগীয় কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী এবং তাঁর প্রধান সহচর মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ হলেন। (৬ই মে, ১৮৩১খৃঃ)। সমাপ্ত হলো জিহাদ আন্দোলনের এক অধ্যায়।

বালাকোট যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা দু'শতাধিক বলে বর্ণনা করা হয়। তন্মোধ্যে নেতৃস্থানীয় একশো একচল্লিশ জনের নাম যুদ্ধের রোজনামচা থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই অমর শহীদানের তালিকায় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অন্ততঃ নয়জন মুজাহিদের নাম এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। এরা হচ্ছেন- রাজমহলের মুন্সী মুহাম্মদী আনসারী, মাওলানা শরফুদ্দীন বাঙালী, নোয়াখালীর মাওলানা লুৎফুল্লাহ, মোমেনশাহীর মুন্সী ইবরাহীম, কলিকাতার নওমুসলিম মুহম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার সৈয়দ মুজাফফর হোসাইন ও মৌঃ করিম বখশ, চট্টগ্রাম এলাকার মৌলবী আলীমুদ্দিন এবং চব্বিশ পরগণার মৌলবী ফয়জুদ্দিন।

মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙালীসহ বাংলাদেশের যেসব মুজাহিদ গাজী গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা চল্লিশ জনের মতো বলা হয়। কিন্তু অনেক তালাশ করেও আহত গাজীগণের তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বালাকোটের ময়দানে কাফেলার ভিতরে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্তের ফলেই আমিরুল মুমেনিন হযরত সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীগণ শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এই শাহাদাত জিহাদ আন্দোলনকে এক মুহূর্তের জন্যেও স্তব্ধ করতে পারেনি। হতাবশিষ্ট মুজাহিদগণ সৈয়দ সাহেবের আকস্মিক শাহাদাতের শোক ভুলতে না পারলেও অবিশ্বাস্যরকম দ্রুততার সাথে পুনঃগঠিত হয়েছিলেন এবং পশ্চিমদিকে গভীর পার্বত্য এলাকায় সরে গিয়ে সিতানায় কেন্দ্র স্থাপন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন।

বাংলার মুজাহিদ গাজীগণ মাওলানা ইমামুদ্দিনের নেতৃত্বে দেশে ফিরে আসলেন। ছুফী নূর মুহাম্মদ সিতাকুন্ড পাহাড়ের পাদদেশে নেজামপুরে এসে আস্তানা স্থাপন করলেন। মাওলানা আদুল হাকীম স্থান নির্বাচন করলেন চট্রগ্রাম থেকে আরো দূরে আরাকান সড়কের পাশে গভীর অরণ্যানী ঘেড়া চূনতী গ্রামে। মৌলবী এনায়েতুলাহ উরফে মিয়াজান কাজী দেশে ফেরার পথে পানিপথে গ্রেফতার হয়ে ফাসীর মঞ্চে শাহাদাত বরণ করেছলেন। মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙ্গালী দীর্ঘকাল সিতানার কেন্দ্রে অবস্থান করার পর নোয়াখালীর হাজীপুরে ফিরে এলেন। এদিকে ঢাকার বংশাল এলাকায় গড়ে তোলা হলো আন্দোলনের গোপন কেন্দ্র। এখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে পাটনা এবং পাটনা থেকে বাহওয়ালপুরের খানপুর হয়ে মুজাহিদগণএর কাফেলা নিয়মিত সিতানায় যাতায়াত করতে লাগলো। প্রায় এক শতাব্দিকাল ধরে অব্যাহত ছিলো এই যোগাযোগ। বংশালের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন ছিলেন অত্র অঞ্চলের মুজাহিদগণের অন্যতম প্রধান মুরুব্বী। তিনি নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে পাটনার কেন্দ্রে প্রেরণ করতেন। পাটনা থেকে সে অর্থ চলে যেতো মুজাহিদগণের সিতানার ছাউনীতে। লোক-লস্কর সংগৃহীত হতো এবং তাঁরাও হাজী সাহেবের লেখা নিয়ে চলতেন পাটনায় ফুলওয়ারীতে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন ছিল মূলত সংস্কারধর্মী। সীমান্তে মুজাহিদ অভিযান ছিল এর একটা অধ্যায় মাত্র। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে তিনি মুজাহিদীনের কাফেলাকে সীমান্তের দূর্গম পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল। মুজাহিদীনের রক্তদানের বদলায় সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের মুসলমানগণ আগ্রাসী শিখ শক্তির নির্যাতন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছিলেন। উপরন্তু পেশোয়ারকেন্দ্রিক একটি ইসলামী খিলাফত কায়েম করে চার বছরাধিকাল তা পরিচালনা করার মাধ্যমে পরবর্তী যুগের ঈমান-সম্বৃদ্ধ মুসলমানদের সামনে নবুওতের আদর্শে খিলাফতের এমন এক বাস্তব নমুনা তিনি পেশ করে গেছেন, যা আজ পর্যন্ত ইসলামী হিলাফত প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

হযরত সৈয়দ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের উত্তরাধিকার যাঁরা এ বাংলার জমিনে বহন করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী। ইনি সারা জীবন বাংলা-আসামে ঈমান-আখলাক সংস্কারের প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বাংলার মাটিতেই চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। তাঁর সে প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা তাঁর সুযোগ্য বংশধর এবং বহুসংখ্যক অনুসারীর মাধ্যমে এদেশে আজো অব্যাহত রয়েছে। মাওলানা ইমামুদ্দিন ও মাওলানা আবদুল হাকীম প্রধানত মুজাহিদ সংগঠনের কাজেই নিয়োজিত থাকেন। জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তাঁরা এ কাজ করে গেছেন। মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

সূফী নূর মুহাম্মদের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন কলকাতার সূফী ফতেহ্ আলী। সূফী ফতেহ্ আলীর খলীফা বাংলার মোজাদ্দেদ ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক এবং তাঁর খলীফাগণের মধ্যে শর্ষিনার মাওলানা নেছারউদ্দিন ও চব্বিশ পরগণার মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের দীনি খেদমত এদেশে সর্বজনবিদিত।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের এসব অনুসারীর কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ওয়ায-নসিহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এদেশের পর্যুদস্ত মুসলমানের ঈমান-আকীদার সংস্কার করার সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার এবং শোষিত-নৈরাজ্য-পীড়িত জনগণের মধ্যে অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। অপরদিকে বালাকোট পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রাম সিপাহী বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন পর্যন্ত যতগুলো গণ-আন্দোলন হয়েছে, তার প্রতিটি আন্দোলন সংগঠনে সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করার মতো।

মুহিউদ্দীন খান

ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (১৯৩৫-২০১৬) ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় আলেম, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। মোমেনশাহী জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন আনসার নগর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মাওলানা খানের পিতা বিশিষ্ট সাধক পুরুষ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ মৌলভী হাকিম আনছার উদ্দিন খান। তাঁর মাতা মোছাঃ রাবেয়া খাতুন। নিজ গ্রামের পাঁচবাগ মাদরাসা থেকে ১৯৫১ সালে আলিম ও ১৯৫৩ সালে স্কলারশিপসহ ফাজিল পাস করেন। ১৯৫৩ সালে উচ্চশিক্ষার্থে ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ সালে হাদিস বিষয়ে কামিল ও ১৯৫৬ সালে ফিকহ বিষয়ে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। মাদ্রাসায়ে আলীয়া ঢাকায় থাকাবস্থায়ই তিনি সাপ্তাহিক কাফেলা, সাপ্তাহিক নেজামে ইসলাম, দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক আজাদ ও দৈনিক মিল্লাত প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখির- অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক পাসবানের শিক্ষানবীস লেখকরূপে পরে জীবিকার টানে ১৯৫৫ ঈসায়ী সনের শেষের দিকে কামেল পরীক্ষার পর দৈনিক পাসবান পত্রিকায় কাজ করেন।

গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার এ টি এম আবদুল মতীনের সহযোগিতায় □দারুল উলুম ইসলামী একাডেমি□ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। স্বাধীনতার পর এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে □ইসলামিক ফাউন্ডেশন□ রাখা হয়।

তিনি বিশ্ব মুসলিম লীগ □রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী□র কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের প্রধান, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প মদীনা মুনাওয়ারাহ সৌদি আরব কর্তৃক মুদ্রিত তাফসীরে মারেফুল কোরআন এর বাংলা অনুবাদক ছিলেন।

তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি কালজয়ী পত্রিকা মাসিক মদীনা সম্পাদক (১৯৬১), মাসিক মদীনা পরিবারের গৌরবদীপ্ত আলোকবর্তিকা, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদনা পরিষদের চেয়ারম্যান, রাবেতা আলম আল ইসলামীর কাউন্সিলর, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি হাসপাতালের কেন্দ্রীয় সদস্য, মুতামার আল আলম আল ইসলামী এর বাংলাদেশ শাখার প্রেসিডেন্ট, জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলন- ইসলামী মোর্চার সভাপতি, ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামের প্রধান।

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ২০০৫ সালের ৯ ও ১০ মার্চ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান □ভারতীয় নদী আগ্রাসন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির ব্যানারে টিপাইমুখ অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের ডাক দেন। এতে দেশের প্রায় ৩০টি সংগঠন যোগদান করে।

অসহায়, দরিদ্র ও ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, সম্বলহীন লোকদের বসতবাড়ি নির্মাণসহ সার্বিক কল্যাণে তিনি কাজ করে গেছেন। বান্দরবন জেলার কয়েক শ□ উপজাতি পরিবার তাঁর সহযোগিতায় ইসলাম গ্রহণ করে। সেখানে প্রায় তিন শতাধিক নারী-পুরুষকে তিনি □তাওহিদ মিশন□ নামক সংস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসন করেন।

প্রতিভাধর মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলা ভাষায় সিরাত সাহিত্যের বিকাশে তার অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি প্রায় ২০০ খানা গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। তার সম্পাদিত □মাসিক মদীনা□র প্রশ্নোত্তর সঙ্কলন □সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব□ ২০ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদের মধ্যে বিশেষত, (১) মা□রেফুল কুরআন □ মুফতি শফী (৮ খন্ডে) (২) আল্লামা শিবলী নুমানী ও সাইয়েদ সুলাইমান নোমানীর □সীরাতুন্নবী□ (৩) ইমাম গাজ্জালীর □ইয়াহইয়া উলুম আদ-দ্বীন□ (৫ খন্ডে) (৪) আল্লামা শিবলী নুমানীর □ফারুক□ (৫) ইমাম আবুল আব্বাস জয়নুদ্দীন হানাফীকৃত □তাদরিজুল বুখারী□ (৬) আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতীর ২ খন্ডে □ খাসায়েসুল কুবরা□ (৭) মাওলানা হামিদ নদভীকৃত ইমাম গাজ্জালির □তাসাওফ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা□ অন্যতম।

তাঁর নিজের উল্লেখযোগ্য লিখিত বই এর মধ্যে কিছু হোলোঃ (১) প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ (২) স্বপ্নযোগে রাসূল সা (৩) মাকতুবাতে ইমাম গাজ্জালী (৪) কুড়ানো মানিক (৫) ইমাম যাইনুল আবেদীন (৬) সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব (২০ খন্ডে) (৭) হাসানুল বান্নার রচনাবলী (৮) প্রিয় নবীর অন্তরঙ্গ জীবন (৯) আজাদী আন্দোলন (১০) বাংলা শিক্ষা □ বাংলা একাডেমী (১১) কুরআন পরিচিতি (১২) ইসলাম ও সমকালীন বিস্ময়কর ঘটনাবলী (১৩) হাদীসে রাসূল (১৪) হৃদয়তীর্থ মদিনার পথে (১৫) মৃত্যু ও পরকাল প্রসঙ্গ।

দেশি ও আন্তর্জাতিক পুরুস্কারের মাঝে বিশেষ হোলোঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরুস্কার, নিওয়ানো পিস এওয়ার্ড (জাপান), তমদ্দুন মজলিসের শান্তি পুরুস্কার, জাতীয় ব্যক্তিত্ব সংবর্ধনা (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক একাডেমী), বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য সাপ্তাহিক গতি (কলিকাতা), গুণীজন সংবর্ধনা পুরুস্কার পদক (মাওলানা ভাসানী রিসার্চ একাডেমী) এবং সিরাত চর্চার জন্য সিরাত স্বর্ণ পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।